Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 18–27
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ব্যাধখণ্ড : এক বিস্মৃত প্রায় জাতির ইতিহাস ফিরে পাওয়ার আখ্যান

তমাল মুখোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি
ই-মেইল: tamalmukhopadhyay5@gmail.com

Keyword
কবিকঙ্কন, ব্যাধখণ্ড, জাতি, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সমাজজীবন, সমাজবিন্যাস, খাদ্যাভ্যাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, বিশ্বাস, প্রথা, ট্যাবু

Abstract
একদা আর্যায়নের সময়কার প্রাচীন ভারতের সেই প্রবল পালাবদলের দিনগুলোতেও যে জাতি আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজের স্থান ধরে রেখেছিল সেই শবরেরা উৎপীড়িত, উৎখাত, অবদমিত, উপেক্ষিত হতে হতে ক্রমশ বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। ইতিহাসের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দিয়ে, তাদের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে 'ব্যাধখণ্ড' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪, কলিকাতা পুস্তক মেলা) উপন্যাসটি মহাশ্বেতা দেবীর হাতে অন্যতম আয়ুধ। শবর জীবন ও তাদের সংস্কৃতি, আচার, বিচার, প্রথা, সংস্কার, সামাজিক বিন্যাসের সাথে সাথে ঐ আরণ্যক মানুষগুলোর মনস্তত্ত্বকেও তিনি যেভাবে অনুপুঙ্খতার সাথে তুলে ধরেন তাতে তাঁর অনুসন্ধানের ব্যাপ্তি যেমন বোঝা যায় তেমনি অনুভব করা যায় কত গভীর ভাবে তাদের অন্তরাত্মাকে তিনি স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' এক আখেটিয়া ব্যাধকে নায়ক হিসেবে পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে ছিল বুনো দুর্ধর্ষ, আর্যদের গন্ধমাখা অরণ্যজীবি, পরিপূর্ণ শবর সন্তান সে নয় কারণ তাঁর স্রষ্টা সে জীবন থেকে বহুদূরে। অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবীর একটা বড় পরিচয় তিনি 'শবর মাতা'। যদিও শবর জীবন ও ইতিহাস তাঁর অনুসন্ধেয়, তবুও ঔপন্যাসিক সুলভ তদ্‌গত দৃষ্টিকেও ভোলেন না; তাই রচনাটি শিল্পসৃষ্টি হিসেবেও সার্থক হয়েছে। 'ব্যাধখণ্ড' দেশ-কাল-জাতির পরিচয়কে ধারণ করেও তার সীমা অতিক্রম করে বাংলা, বাঙালী জীবন, রোজনামচা, মনস্তত্ত্ব, প্রেম, বিরহ, সুখ-দুঃখের আলো ছায়াপাত সমেত কালোত্তীর্ণ এক নির্মাণ। দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি, তাদের সংঘর্ষ, প্রবল সংস্কৃতির আগ্রাসনের হাতে পুনরায় পর্যদুস্ত শবরদের ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া, নিয়তি তাড়িত শবরদের কুমারী অরণ্যের উদ্দেশ্যে প্রস্থান নিয়ে এই নির্মাণ আসলে একাধারে ইতিহাস, গবেষণা, উপন্যাস ও ট্র্যাজেডি। আবার এই মত ব্যতিক্রমী সৃষ্টির হাত দিয়েই কথাকার সমকালের গড্ডালিকা প্রবাহের স্বাচ্ছন্দ্য ও জনপ্রিয়তাকে উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক হিসেবে মহাকালের বুকে অমরত্ব পান।

Discussion

বিশ্বায়ন, উত্তর আধুনিকতার ছায়া যখন গাঢ়তর হচ্ছে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বোধের ওপর; যখন সাহিত্য তার কাহিনিতে, বুনোটে; আবহে, সমস্যায়, চরিত্রে, সংঘাতে, সংবেদনায়, প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত বোধের প্রবল অংশীদার; তখনও খুব দৃঢ়ভাবে যিনি মাটির বুকে কান পেতে 'সত্য' ভারতের রক্তের স্পন্দন নিজের হৃদয়ে অনুভব করছিলেন তিনি মহাশ্বেতা দেবী। আদিবাসী, দলিত, প্রান্তিক জনমানুষের জন্য তাঁর দরদ, সক্রিয়তা, আন্দোলন, প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার কথা বহু শ্রুত, বহু আলোচিত। একদা পালামৌর বুকে এক অন্য ভারত ও ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসাটা তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছিল। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ওরাঁও, মিজ, মাহালি প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের জীবন, তাদের ইতিহাস, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, জীবনসমস্যা, মূলধারার থেকে বিচ্ছিন্নতা, অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, অস্তিত্বের ভয়াবহ সংকট নিয়ে তিনি ভেবেছেন ভাবিয়েছেন সক্রিয়ভাবে অসংগতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন ভূমিদাস রূপী সেই অন্তেবাসীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা, গণহত্যা, নূন্যতম মানবিক প্রত্যাশাকেও দমিয়ে রাখার ট্র্যাডিশনে; ইংরেজ পূর্ব ভারত, ইংরেজ সমকালীন ভারত বা স্বাধীনোত্তর ভারত—কোথাও সেই ব্যবস্থায় আঁচ লাগেনি। আধুনিক বিশ্ব যখন মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে তখনও তাদের জীবন 'বিক্রম সম্বতে' আটকে রাখা হয়েছে। এই ক্ষোভ তাঁর সাহিত্যে ঝরে পড়েছে আমৃত্যু। তবে তাঁর সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য মতবাদের প্রচার-প্রসার নয়। সৃষ্টি জগতের কুশীলবরা প্রায় এক জগতের মানুষ হলেও তাদের সমস্যাগুলো গভীরতলে দেশ-কাল-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। তিনি মানব প্রেমিক, তাই বিশেষ গণ্ডীবদ্ধ মানুষের হৃদয় দিয়ে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে স্পর্শ করেন।

তাঁর 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু'-র কবি কলহন, আধুনিক, নতুন যুগের মানুষ। যা অবশ্যম্ভাবী রূপে তাকে সময় ও সমাজে দুর্বোধ্য করে তোলে। পরিশেষে সামাজিক বৈষম্যের পরিপোষক অভিজাত সামন্ত প্রভু তাকে হাতির পায়ে পিষে মেরে পৈশাচিক উল্লাসে মাতে। তার সাহিত্য সাধনা প্রকৃতপক্ষে এক আদিবাসী দলিত মানুষের আত্মপ্রকাশের; স্বাধীনভাবে বাঁচার, মুক্ত আকাশে ডানা মেলার আকুতির, বেড়াভাঙ্গার উলগুলান। এক্ষেত্রে হাতিয়ার কলম। আবার 'অরণ্যের অধিকার'-এ বিরসা যখন তীর-ধনুক তুলে নেন তখন তাদের বিদ্রোহের প্রকৃতিগত দিকে পার্থক্য থাকলেও মৌলিক লক্ষ্য গভীরতলে এক। সেই বিদ্রোহের মশাল হস্তান্তরিত হয়েছে 'চোট্টিমুণ্ডা এবং তার তীর', 'সিধু কানুর ডাকে', 'শালগিরার ডাকে', 'সবুজ গাগরাই', 'ক্ষুধা' প্রভৃতি উপন্যাসে। তারা সবাই লড়ছে কেবল অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্যই নয়, বৃহত্তর অর্থে মহাকালের বুকে নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতি-কৃষ্টি, কাল্ট-এর যোগ্য মর্যাদার আসনের দাবী নিয়ে। এই পথ চলাতেই মহাশ্বেতা দেবীর সাথে পরিচয় হয়েছিল শবরদের সাথে। শবরদের জন্য তাঁর ধারাবাহিক লড়াই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক প্রসঙ্গ। বিশেষত; আদিবাসীদের মধ্যেও এই উপজাতির প্রতি বিশেষ উপেক্ষাটি তাঁরও নজর এড়ায়নি। কখনও তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি'র কার্যকারী সভাপতি হিসেবে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, কখনও তাঁকে দেখি পুলিশি নির্যাতনে মৃত বুধন শবরের বিচার চাইতে আদালতে, সামান্য অপরাধে ললিত শবরের কব্জি কেটে নেওয়া হল, তার চিকিৎসার জন্য প্রণিপাত করছেন মহাশ্বেতা দেবী ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন শবর জননী। তার পরেও লিখলেন একটা 'ব্যাধখণ্ড'। তাঁর মত প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক কেবল শবর জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে যে উপন্যাস লিখবেন না তো বেশ বোঝা যায়। তাই বহুমাত্রিক ও তাৎপর্যপূর্ণ এই উপন্যাস সচেতন ও বিশেষ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

আলোচ্য উপন্যাসের শুরুতে শিরোনামহীন একটা প্রাক্কথন আছে। সেখানে এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে কাব্যে সমদ্দর দেবার জন্য মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রশংসার পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এটাও স্বীকার করেছেন যে উক্ত গ্রন্থ তাঁর উপন্যাসের আকর। এ কথা অনস্বীকার্য যে কবি কঙ্কণের 'অভয়ামঙ্গল'-এর 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশ বাংলা সাহিত্য ধারার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে কেবল তৎকালীন রাষ্ট্রিক দুর্যোগে গ্রামবাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষদের অসহায় দুর্ভাগ্য পীড়িত দিনগুলোর ছায়াপাতই ঘটেনি। অন্তর্জগতের আলোড়নের প্রছন্ন সুরও ধ্বনিত হয়েছে। বাস্তবতা, চরিত্র সৃষ্টি, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, দৈনন্দিন জীবনচর্যা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম-বিরহ-যন্ত্রণা-আনন্দ মিলে উপন্যাসের সম্ভাবনা ধারণ করে থাকা 'অভয়ামঙ্গল'-এর আবেদন কালোত্তীর্ণ বলেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর আধুনিক কবিতার সংকলন—

'বাংলা কাব্য পরিচয়' (১৩৪৫ ব:)-তে কাব্যের 'ঘুম পাড়ানি গান', 'মেঘে কৈল অন্ধকার' ও 'বারমাস্যা'-কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ব্যক্তির অন্দরমহলের আলোছায়াতো কোনো বিশেষ কালের কাছে বাঁধা পড়ে না। তা চিরকালের আধুনিক। কাব্যের 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশের ইতিহাস অংশের এক বিশেষ ভূমিকা আছে এই উপন্যাসে।

'অভয়ামঙ্গল'-এ মুকুন্দরামের দামিন্যায় বাস আর দামিন্যা ত্যাগ করে আরড়া যাওয়ার ইতিহাসের মধ্যে যে বিপুল শূন্যস্থান আছে, সেই শূন্যস্থান যে উপন্যাসের বিষয় হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত তা ঔপন্যাসিকের নজর এড়ায়নি। কর্ণপুর থেকে প্রপিতামহ মাধব ওঝাকে দামিন্যা নিয়ে এসেছিলেন বীরদিগর দত্ত। পেয়েছিলেন গ্রামদেবতা, গৃহদেবতার পূজার ভার ও সসম্মানে বেঁচে থাকার রসদ। সেই উত্তরাধিকার বহন করেছেন পিতামহ মহামিশ্র জগন্নাথ, পিতা 'গুণরাজ মিশ্র' উপাধিক হৃদয় মিশ্র, দেশান্তরী ভাই কবিচন্দ্র ও স্বয়ং মুকুন্দরাম। তবে এই শুষ্ক ইতিহাস বর্ণনা ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় নয়। তিনি এই ইতিহাসের অবলম্বনে ফুটিরে তুলতে চান ৯৫১ বঙ্গাব্দের গ্রামবাংলার ছবি। আর তাই বড় করে বললেন প্রপিতামহ মাধব ওঝার দামিন্যা আসার বৃত্তান্ত। দামিন্যার বিখ্যাত দত্তদের বংশের বুড়ো পুরোহিত বলেছিলেন কুলেশীলে মানী বিদ্যায় জ্ঞানী, স্বভাবে নির্লোভ ব্রাহ্মণকে বসত করাতে। তাঁর বংশের বাতি দেওয়ার কেউ ছিল না। যাকে উত্তরাধিকারী করবেন ভেবেছিলেন সেই সন্ন্যাসী অনাচারের চূড়ান্ত করল। শ্মশানের শেওড়া, ছাতিম এনে লাগালো ঘরে, মাংস মদ খাওয়া চলল বিস্তর, 'মাঘ অশ্লেষা মানত না। গ্রামীণরা এমন অনাচার সহ্য করবে কী করে? এলেন মাধব ওঝা। এইভাবে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার মেলবন্ধন হল। এভাবে মাধব ওঝার আসার কারণটি সমাজ বাস্তবতার কার্যকারণ সূত্রে স্থাপন করলেন। এই অংশে; তৎকালীন সমাজজীবন, সমাজবিন্যাস, খাদ্যাভ্যাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, বিশ্বাস, প্রথা, ট্যাবু গবেষকদের আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু আমরা দেখব গল্পের পর গল্প বুনে মুকুন্দরামকে এই মাটিতে গভীরভাবে স্থাপন করছেন লেখিকা। প্রকৃতপক্ষে এই অংশ তাঁর বৃহত্তর অভিপ্রায় সিদ্ধ করবে। ইতিহাস যত বাস্তব, মাটির সাথে সম্পৃক্ত ও বিশ্বাস্য হবে শিকড় হবে তত গভীর আর শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা হবে আরও করুণ।

মামুদ সরিপের অত্যাচার অংশটিতে কবি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য বা ইতিহাস সমর্থিত তথ্য থেকে সরে আসার কোনো প্রচেষ্টা ঔপন্যাসিকের নেই। মামুদ সরিপের অত্যাচার, গোপীনাথ নন্দীর কারারুদ্ধ হওয়া; চণ্ডীবাটির শ্রীমন্ত ও গম্ভীর খাঁর পরামর্শে দামুন্যা ত্যাগ, মধু দত্তকে একটাকার জিনিশ দশ আনায় বিক্রি, রাস্তার ভেলোগ্রামে ডাকাত কর্তৃক সর্বস্ব লুঠ, যদু কুণ্ডুর ঘরে আশ্রয়। গোচড়্যাতে পুকুরের ধারে নিদ্রা, সেই প্রবাদ প্রতিম—

"তৈল বিনা কৈলু স্নান / করিনু উদক পান / শিশু কাঁদে ওদনের তরে"[১]

প্রভৃতি বর্ণনার মাঝেও ইতিহাস ছাপিয়ে ফুটে ওঠে মানব জীবনের উত্থান-পতন-পুনরুত্থানের দিনলিপি। ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল খড়ে, মাটিতে। প্রতিমার সৌন্দর্য আর তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইতিহাস অতিক্রম করে এক রক্তমাংসের মানুষের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে। গ্রামবাংলার এক ব্যক্তি যার পিতা নেই, দাদা দেশান্তরী, বিধবা মাকে নিয়ে একা সংসার সমুদ্রে লড়াই করেছে হৃদয়ে সৃষ্টির আকুতিকে চেপে রেখে। এই মুকুন্দ কোনো কবি নন তিনি চেনা পরিচিত সাধারণ মধ্যবিত্ত অংশের প্রতিনিধি যারা মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে রোজ দমন করে লড়াই করে, ক্ষতবিক্ষত হয় কিন্তু মুখে লেগে থাকে তৃপ্তির হাঁসি। লড়াই শেষে যখন মনে হল একটা সমাধান হল, তখনি আবার লাগল আগুন। এবার তিলতিল করে গড়ে তোলা সবকিছু, জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত প্রিয় সব কিছুকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। তারপর সেই মর্মন্তুদ অংশের যন্ত্রণা, কষ্ট, হাহাকার, পথের সম্বল যখন রাস্তায় হারিয়ে যায়, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আর্তনাদ ওঠে—

"আ গো! আমরা বড় দুঃখে পথে বেরিয়েছি, একটু রাতের আশ্রয় দেন গো!"[২]

যখন—

"শিবরাম: 'ভাত দে, মা ভাত দে বলে বড় কাঁদছিল' মা বলছিল শালুক নাড়া খেয়ে দেখ শিবু কেমন মিষ্টি?"[৩]

—এই ভয়াবহ দিনগুলোর মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত মুকুন্দ কি কেবল একা? দেশভাগ, ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া উদ্বাস্তু মানুষদের স্রোতের সে কী একজন নয়? তখন কি কেবল তাকে ৯৫১ বঙ্গাব্দে, দামিন্যাতে সীমাবদ্ধ রাখা যায়? ১৯৪৭ খ্রি: পরবর্তী উদ্বাস্তুদের ভয়ঙ্কর দিনযাপন ও পথ চলার স্মৃতি উসকে যায় না? ঔপন্যাসিকের মুকুন্দের যন্ত্রণা, কষ্ট, বিশেষ দেশ বা কালে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সেই সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি যারা ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে পথ হাঁটে। আরড়ায় পৌঁছে মুকুন্দরামের জীবনে আবার স্থিতি, সুখ, সমৃদ্ধি, সুবিধা, সমাদর এল কিন্তু মনের স্মৃতিকোঠা থেকে জন্মভূমি গেল না। বৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে গেল। এ কাঁটা চিরকাল নীরবে নিভৃতে বিঁধে যাবে —এটাও মানবজীবনের একটা ট্র্যাজেডি।

ঔপন্যাসিক এই অংশে বারবার অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে অতীত (আরড়া থেকে দামিন্যা)-তে যাতায়াত করেন। মুকুন্দর দ্বৈত জীবনের স্বরূপ, পার্থক্য, উপন্যাসের কাহিনি ও কালগত ব্যাপ্তির দিক থেকেও যা সহায়ক। মুকুন্দর 'দামিন্যা'-পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গণেশ। অন্ত্যজ গণেশের জ্ঞানের ভাণ্ডার তার জীবন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। নির্ভুল ভাবে বলতে পারত বৃষ্টির সম্ভাবনা, শেখাত মাটির পাঁচালি। শেখাতো মাটি আর মাটির মধ্যকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রও তাচ্ছিল্যের নয়। প্রকৃতি কাউকে ব্রাত্য করে রাখে না। মানুষই মানুষকে অবহেলা করে, ব্রাত্য করে। গণেশ ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের সংরূপ। গণেশের মধ্য দিয়ে সামাজিক অসংগতি প্রতি কষাঘাতও আছে। গণেশই উপন্যাসে খবর আনে দুর্দিন আসছে, আর সেটা সে বোঝে বাতাস নেই অথচ ধর্মঠাকুরের বটগাছের ডাল ভেঙে গেল এটা দেখে। গণেশের মধ্য দিয়েই মধ্যযুগীয় গ্রাম্য সংস্কার-বিশ্বাস, প্রবাদ-প্রবচন তুলে ধরা হয়েছে। সে প্রাচীনপন্থী, প্রাচীন বিশ্বাস খনার বচনকে আঁকড়ে ধরে থাকে। মুকুন্দের গ্রামজীবন ও নগরজীবনের টানাপড়েনের অন্যতম বিন্দু গণেশ। নগর সভ্যতা তাকে অনেক কিছু দিয়েছে গণেশকে দিতে পারেনি। সে প্রাচীন গ্রাম বাংলার শেষ প্রতিনিধি। আবার গণেশ, গিরিরাজ বন্দ্য চরিত্র সেই অনুষঙ্গ যা ইতিহাসের কবি মুকুন্দকে উপন্যাসের চরিত্রতে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে পরিবর্তিত করে। গণেশ প্রকৃতির মাঝে সবকিছু আর সবকিছুর মাঝে প্রকৃতিকে খুঁজে পায়। গণেশের সংস্পর্শ মুকুন্দর জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। তাই গোচড়্যার পুকুর পাড়ে মুকুন্দর স্বপ্নে যে অভয়া এলেন তিনি দেবী বেশে নয় এলেন মাতৃবেশে। যেমন গণেশের স্বপ্নে আসতেন দৈবকী। অভয়া এলেন চিরকালের মাতৃবেশে; কারণ তিনিও কেবল দেবীত্বে আটকা পড়ে থাকতে চান না। তিনি প্রকৃতির কণায় কণায় বিরাজমান। তিনিই মাতৃস্বরূপা প্রকৃতি। মুকুন্দরাম যেন তাঁর সেই মূর্তির বাণী রূপ রচনা করতে পারেন —এই তাঁর আশীর্বাদ ও নির্দেশ।

পূর্বে আলোচিত শিরোনামহীন প্রাক্কথন অংশে ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণ ছিল—

"ব্যাধজীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের অন্তরঙ্গ পরিচয় তো তাঁর অভয়ামঙ্গল পাঞ্চালীর ব্যাধখণ্ড অংশেই বিধৃত।"[৪]

—এই মন্তব্য আংশিক রূপে সত্য। একথা অনস্বীকার্য যে দেবানুগ্রহের সোপান বেয়ে অনার্যজাতির প্রতিনিধি কাব্যকৌলিণ্যের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছে বা কবি "স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কালকেতুর ভাঙা কুটীরদ্বারে বসিয়ে তার দৈবী বিভার আলোকে তাহার রিক্ত গৃহস্থালীর টুকরা টুকরা জীবন আসবাব ও গৃহসজ্জাগুলি আমাদিগকে দেখাইয়ে দিলেন।" [৫]
কিন্তু কাব্য উল্লেখিত কালকেতু আংশিক রূপে শবর বা আখেটিয়া ব্যাধ, তার ওপরকার বৈদিক সংস্কৃতির আবরণটি আমাদের চোখ এড়ায় না। মহাশ্বেতা দেবীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে ঐ আখেটিয়া ব্যাধের বিস্তর অমিল ছিল। কবি মুকুন্দরাম উচ্চবর্ণীয় বৈদিক সংস্কৃতিকে আদিবাসী কৌম জীবনে যথেচ্ছ আরোপ করেছেন। নিদয়ার গর্ভ, সাধভক্ষণ, কালকেতুর জন্ম, বড় হওয়া, জাতকর্ম, বিবাহের অনুষ্ঠানে শবর জীবন থেকে বড় হয়ে উঠেছে অ-আদিবাসী সংস্কৃতি। সেখানে বালক কালকেতু যেন রাখাল কৃষ্ণ, গোলাহাটে কালকেতু-ফুল্লরার চার চোখের মিলনে যেন কৃষ্ণ-রাধার পূর্বরাগের ছায়াপাত। সেখানে বিবাহের অনুবন্ধ নিয়ে আসে ঘটক সোমাই পণ্ডিত। পণ পায় পাত্রপক্ষ, ঘটক পান ঘটকালি। পণে আবার গুয়া গুড়-ও থাকে। বিয়ের ছাদনাতলা, গায়ে হলুদ, বেদমন্ত্র, গণেশ ও সূর্য পূজা, স্বস্তিক সিঁদুর, নান্দীমুখ, অধিবাস, পুরোহিত—সব মিলে মিশে সে এক আড়ম্বরপূর্ণ আর্যামির প্রলেপ। একথা ঠিক যে গৃহসজ্জা, যৌতুক, রান্নাতে ব্যাধজীবনের প্রসঙ্গ তথ্যনিষ্ঠ কিন্তু ব্যাধ সংস্কার বিশ্বাস কবির কাছে বিশেষ কল্কে পায় না, তাই এক লাইনেই সে প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেন—

"একে একে কৈল কর্ম্ম / যে ছিল কুলের ধর্ম / ধর্মকেতু কৈলা সমাপন।"[৬]

সেই মানসিকতাই প্রবল বলে ধর্মকেতু নিদয়ার শেষ জীবনে কাশীবাস নির্দিষ্ট হয়। কালকেতু গুজরাট নগরীতে সমস্ত সম্প্রদায় ধর্ম-জাত-বর্ণের পাড়া আছে নেই কোন শবর পাড়া। কালকেতুর প্রতি ফুল্লরা উপদেশ সে কারণে বারবার আসে পৌরাণিক রাম-রাবণ-সীতা বা বালী-সুগ্রীব-তারা প্রসঙ্গ। কাব্যের কালকেতু শবর হয়েও সেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। ঔপন্যাসিকের অনুসন্ধেয় শবর সমাজ থেকে সে অনেক দূরে। 'ব্যাধখণ্ডে'-তে আমরা যে শবরের সন্ধান পাই তারা অনেক বেশি বাস্তব। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের সহায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধান।

'ব্যাধখণ্ড'-তে শবরদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বাস্তব, অনুপুঙ্খ ও বিস্তৃত ছবি আঁকা হয়েছে। শবর বনের সন্তান, বন ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। বন শেষ হলে আবার তারা চলে যাবে শিলাবতী, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা নদী, ব্রাহ্মণভূম, বরাভূম, মানভূম, মল্লভূমে। যেখানে অরণ্য কুমারী সেখানে শবর বাসা বাঁধবে। পৌরাণিক সময়ে ব্যাধ অস্পৃশ্য ছিল না, এখন সমাজে তারা অন্ত্যেবাসী, প্রান্তিক, অচ্ছুত। কিন্তু ব্যাধ পরিচয়ে কোথাও তাদের হীনমন্যতা নেই বরং আছে প্রচ্ছন্ন গর্ব। তারা জানে না তারা দরিদ্র। তাই মুকুন্দরামের ফুল্লরার কণ্ঠে বারমাস্যা শোনা যায় উপন্যাসে কদু সে ভূমিকা নেয়। দুঃখ, দারিদ্র, অভাব, অভিযোগ কী তা তো আর্য নাগরিক জীবনের জানার কথা, শবর তার খবর কোথায় পাবে? তাদের জীবনে ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিক সম্পদ, অর্থসঞ্চয় বা টাকার কোনো স্থান নেই। তারা জমি দখল করে না, চাষও করে না, চাল কেনে। জঙ্গল তাদের যোগায় মাংস, পাখি, চাম, কাঠ, মধু, ধুনা, ফল-মূল —যা বিক্রি করে তাদের জীবন আনন্দেই কাটে। নিজেদের সমাজে গোষ্ঠীপতিকেই তারা মানে, অন্য কাউকে রাজা বলে স্বীকার করে না, কর দেয় না, এ নিয়ে মুকুন্দর মনে ক্ষোভ আছে আসলে সে রাজতন্ত্রে একটা সুবিধাভোগী অংশ, মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিনিধি, ক্ষোভের উৎস সেটাই।

শবরদের স্ত্রী-পুরুষ খুব পরিশ্রমী, শরীরে তাদের প্রচণ্ড শক্তি। তারা শিকার করে কিন্তু অনর্থক পশু হত্যা করে না। অরণ্য আদিমতার যেমন অকারণ হিংসা নেই, হত্যা নেই, ধ্বংস নেই শবরেরা সেই প্রথাকে মান্য করে চলে। বিচারের জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ তারা হয় না। সমাজ অপরাধের বিচার স্বয়ং করে। অপদেবতা থেকে শুরু করে গৃহবন্ধন, ঔষধ, শিকারের অনুমতি, এমনকি নবজাতকের আগমনবার্তাও তাদের দলপতিই দেয়। তাদের ঘর অস্থায়ী, লতাপাতার। তারা অরণ্যের মুক্ত সন্তান, ধরিত্রীর মানসপুত্র, দখলদারি মনোভাব তাদের কোথাও নেই। তাদের আছে বাঘুতঠাকুর, বড়াম মা, ধনকুঁদরা, কালাপাহাড়। ফাল্গুন মাসে শাল মহুলের বিয়ে দেবে, সারারাত নাচবে, তাদের হাসি আর গান থামে না কখনো। ঔপন্যাসিক শবর জীবন আঁকতে গিয়ে কতখানি তথ্যনিষ্ঠ তা 'অভয়ামঙ্গল' ও 'ব্যাধখণ্ডের বিবাহ প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যায়। আখেটিক ব্যাধের বিয়েতে মা-বোন-ভাজেরা জলে তীরের ফলা ঘুরিয়ে কুইলি জল আনে, মেয়েরা পাখি, খরা, সজারু মেরে আনে। বিয়ের আগে সব মেয়ের সাতপাক মহুয়ার সাথে, ছেলেরা আমগাছের সাথে ঘোরে। গাছই তাদের মূল আত্মা, গাছের মত জীবন তারা কামনা করে। গাছ যেমন আশ্রয় দেয় অন্ন দেয়, গাছ যেমন মৃত্যুকে জয় করেছে। গাছের মধ্য দিয়ে গাছ হয়ে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করে তারা।

তাই মুকুন্দরামের কালকেতু আর মহাশ্বেতার কাল্যাও এক না। কালকেতু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কাল্যার কিন্তু তা অর্জনের পথে শবর গন্ধ মুছে ফেলবে না সে। মেঘা আর তেজটার প্রবল প্রেমের সন্তান কাল্যা। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রেম, বাঘ শিকার, ফুলির প্রতি পূর্বরাগ-অনুরাগে কোথাও রাখালিয়া কৃষ্ণ নেই। আছে আদিবাসী সমাজের সমস্ত চিহ্ন। তবে কাল্যা অন্যান্য শবর যুবদের থেকে একটু পৃথক। ফুলিকে নিয়ে নিভৃতে ঘর বাঁধে। ফুলিকে মারে, শিকার করেই খালাস, সংসারে তার মন নেই। আবার ফুলি রাগ করে চলে গেলে—

"ফুলি কোথা গেলি রে, আমি নয়নে আঁধার দেখি বলে গাছে মাথা ঠুকে।"[৭]

তার প্রেম, প্রেমের প্রকাশ সমস্তর মাঝে এক বিশিষ্টতা আছে—

> "সব বন্য উদ্দাম স্বাভাবিক। ভালোবাসা প্রচণ্ডতা বর্বর প্রহার আবার এ-ওর জন্য পলে পলে মরে। মুকুন্দর এ জীবন দর্শকের মত দেখে জানে না সেই জীবনের স্বাদ কেমন?"[৮]

—মুকুন্দর জীবনে প্রেম, মুকুন্দর চোখের সামনের প্রেম তো নাগরিক কৃত্রিমতার ঝলকানি। এমন আদিম, সহজ, সরল, অনাবৃত, আবিলতাহীন, আয়োজন মুক্ত, অনুষ্ঠান সর্বস্বতা বহির্ভূত, পুঁথিপড়া প্রেমের থেকে পৃথক, প্রেমের সাথে সাক্ষাৎ মুকুন্দদের হয় না। এ জীবন থেকে মুকুন্দরা শতসহস্র যোজন দূর।

কাল্যা সেই চিরায়ত শবর সমাজের প্রতিনিধি যারা আত্মমর্যাদাপূর্ণ প্রাচীন এক জাতি। যে জাতির ইতিহাসে সব থেকে বড় বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ; সেই ব্রাহ্মণ যার প্রতারণায় দেবী কেবল শিলাপট্ট থেকেই চলে যায়নি, শবর সমাজ থেকেও দূরে সরে গেছেন। তাই ব্রাহ্মণদের মান্য করে না কাল্যা। নগর সভ্যতার প্রতি তার একটা বিদ্রোহ ও দ্বেষের ভাব আছে, নাগরিকতার গন্ধ ঘরে ঢুকলে তার হৃদয়ে আগুন জ্বলে। ফুলির প্রতি এই জন্য তার ক্রোধ। ফুলি চায় মাথায় তেল, পরনে ফর্সা কাপড়, মুখে মিষ্টি কথা, পরিষ্কার পাকা ঘর। ফুলি বামুন ঘরের মেয়েদের মত স্বামীর অপেক্ষায় না খেয়ে বসে, মুখে 'তুমি' সম্বোধন। ক্রোধে অস্থির হয়ে কাল্যা ফুলিকে 'ঢিপায়', তার এই ক্রোধ প্রকৃতপক্ষে এক বিশিষ্ট, গোষ্ঠীবদ্ধ সভ্যতায় বহিরাগত ভাবধারার আক্রমণের বিরুদ্ধে সচ্চোর প্রতিবাদ। এই কাল্যা মুকুন্দরামের কালকেতু না যে শিকারের জন্য জঙ্গল উজাড় করে দেবে। কাল্যার ধমনীতে অরণ্যের সন্নত বৃক্ষ কুলের স্পন্দন, জীবকূলের উত্তাপ তার বুকে। তাই কাল্যা কোনো অর্থের প্রলোভনই হরিণের প্রজনন ঋতুতে শিকার করবে না, বরং শাসাবে—"বান্যাদের ফেড়ে ফেলে দিব", কাল্যা ঔপন্যাসিকের মানসপুত্র। ইতিহাস বিশ্রুত এক জাতির কাঙ্ক্ষিত উত্তরসূরী। হৃদয়ের স্বপ্ন মিলিয়ে তিলে তিলে নির্মাণ—

> "ও তো অন্য শবর নয়। পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করে মজা পায়।
> বলল, পুঁথি পড়ি নাই, অং বং চং জানি না, ভাত পেলে ভাত না পেলে আমসি, খরা; শজারু পোড়া, বনবরা পোড়া খাই, বনে বনে ফিরি। হাঁকুর মেরে বাঘেকে ডরাই। আমাদের কথা মিষ্ট কেমন করে হবে?"[৯]

কাল্যা বুনো কিন্তু সহজ সরল; বিধাতা পুরুষের প্রথম সৃষ্টির মত নির্মল।

যদিও কাল্যাদের প্রজন্ম নগরকে এড়াতে পারে না। পেটের তাগিদেই পারে না। তারা ভাত খেয়ে বড় হয়েছে, মুখে আর কন্দ মূল ওঠে না। ভাতের স্বাদ তারা পেলেও ভাত আনার উপায় তারা জানে না। তাই জঙ্গলের সম্পদ নিয়ে পঙ্গপালের মত ছোটে নগরের দিকে। নগরের হাওয়ায় মন মাতোয়ারা তাদের। মাথায় তেল, পরনে ফর্সা কাপড়, দই-চাল-মিষ্টি, পরিষ্কার পাকা বাড়ির লোভ জেগে উঠেছে। তেজটা জানে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির এই আগ্রাসন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাই নেই—

> "না, নগরও অন্দরবাসী ছড়িয়ে পড়বে, অন্তেবাসীজন তাদের ঘরদের রহনসহন রীতকরণ দেখবে। যুবাপ্রজন্ম প্রভাবিত হবে। সনারা সঞ্চয় শিখেছে। ঘরের ছামুতে পাতা নয়, খড় দিবে এবার। মাটি লেপে দেয়ালে চিত্র আঁকছে। এতো ঘটনা। সকল শবরের চেয়ে ওদের রহনসহন আলাদা। সনার বর তাকে ঢিপায় না, সনার মাথায় তেল, ঘরে চাল।"[১০]

এইভাবেই হয়ত ভিন্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে কোন প্রাচীন, সংহতও আপনাতে আপনি বিকশিত সংস্কৃতি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। যেমন সোভিয়েত ভেঙে যাওয়া পরবর্তী বিশ্বায়নের প্রবল আর উৎকট ভাবধারায় কত রুচিবাণ সভ্যতা সংস্কৃতি প্রথা বিশ্বাস অতীতের বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। যখন মানুষ মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, মাটিকে ভুলে ভোগ্যপণ্য সর্বস্ব বিজ্ঞাপনময় পৃথিবীতে আত্মহারা হতে চেয়েছে। এইভাবেই ঔপন্যাসিক কাল ও দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে যান।

ডঙ্ক ধরতে পেরেছিল নিয়তির ডাক। ভাঙনের চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাই ডঙ্ক আর অমৃতগন্ধা শিকড় খুঁজে পায়নি। যা খেলে তার বাড়ত আয়ু, সৃষ্টি করত নতুন শবর প্রজন্ম। হতাশ হয়ে বৃদ্ধ মৃতপ্রায় অজগরের মত অভয়ার দুর্ভেদ্য অরণ্যের দ্বারপাল হয়ে বসে থাকতে থাকতে সে বোঝে বনস্পতির পর এবার বামন গাছের পালা। শবরও হবে বামন। নগর সভ্যতার আগ্রাসনে তাদের আবার আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে নতুন ঠিকানার খোঁজে—

> "নগর আগালে শবর চলে যাবে। কিন্তু শবরের যাবার সময় হলে মা জানাবে তার সেবক ডঙ্ক শবরকে। ডঙ্ক জানবে শবরদের। শবররা খন্তা, কুড়াল, তীর ধনুক নিয়ে চলে যাবে।"[১১]

কাল্যা এই বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল। পদে পদে বিরোধিতা করেছিল নগর সভ্যতার বিরুদ্ধ ও আগ্রাসী সংস্কৃতির আগ্রাসনের। আস্থা রেখেছিল আরণ্যক অস্তিত্বে। তাই কাল্যা একা হয়ে যায়। তার স্বজাতি যখন ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন রীতি, মোহময়ী বস্তুর লোভের মরীচিকা দেখেছে তখন সে-ই স্বধর্মে স্থিত ছিল; ঐরাবতের পায়ের চিহ্ন ছাড়া কিছু দেখেনি। তাই সেই প্রাচীন অতিকায় ঐরাবতের সামনে কাল্যা একা লড়াই করতে বাধ্য হয়। নাগরিক আধিপত্য বাদ, সাংস্কৃতিক বিস্তারবাদের বিরুদ্ধে কাল্যা একা দলছুট তাই তার শেষ পরিণাম পরাজয় ও মৃত্যু। কাল্যার মৃত্যু ঔপন্যাসিকের স্বপ্নের পরাজয়ের গভীর ব্যঞ্জনাও বটে।

শবর শব্দটি এসেছে স্কাইথিয়ান ভাষার 'সগর' থেকে, যার অর্থ কুঠার। রামায়ণ, মহাভারত, হর্ষচরিত, চর্যাপদ, পুরাণে শবরদের উল্লেখ ছিল। ক্রমশ তারা ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের আন্তরিক প্রয়াস শবরদের ইতিহাসে ফেরানো। তিনি শবরদের এমন ইতিহাস লিখবেন যা বৈদিক, আর্য, ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণ বা ক্ষমতাশালীদের প্রসাদ বহন করে না। যেখানে তাদের বিশিষ্ট কৃষ্টি, প্রথা, আচরণ, সংস্কার, ব্যবহারকে তথাকথিত 'সভ্য' সভ্যতার নিক্তিতে মাপা হবে না। সেই ইতিহাসে শবরদের জন্য লেখক 'লজ্জায় মুখ ঢেকে' আর্যায়নের খোলস চাপিয়ে, তাদের প্রকৃত স্বরূপকে কুয়াশাচ্ছন্ন করবে না। সেই শবর যে একসময় সমাজে উচ্চপদে আসীন ছিল, জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মুখ্য পূজারী ছিল অথচ **১৮৭১** খ্রি: ব্রিটিশরা অকারণে তাদের অপরাধ প্রবণ জাতি বলে ঘোষণা করে। তারা ক্রমশ অত্যাচারিত হতে হতে অতীতের ইতিহাসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। সভ্যতার মূল স্রোত, তাদের মূল সমেত উৎখাত করে বিলুপ্তির শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। এই বিপন্নতা থেকে উদ্ধার করা কেবল অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায়নের দিক থেকেই সীমাবদ্ধ নয়, সংস্কৃতি ও তার গভীরতলের অবস্থিত ইতিহাসের দিক থেকেও তাদের পুনর্বাসন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারা যতদিন না ইতিহাস ফিরে পাবে ততদিন মর্যাদাও ফিরে পাবে না।

বস্তুত এই কারণেই 'আখেটিক খণ্ডের' কাহিনির প্রকৃত ভাষ্য আবশ্যক ছিল। এই কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গের শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর ছায়া নয়, তারা অভয়ার হাতে কাঁচা মাটি থেকে তৈরি। পুরাকালে আদিগন্ত বিজুবনে থাকত আখেটিয়া ব্যাধ। প্রথমবার তারা নগর আর উচ্চবর্ণের প্রতারণায় হারিয়েছিল দেবীকে, তার সাথে সাথে তাদের সৌভাগ্যও। কিন্তু একদিন দেবীর দয়া হল। গড়লেন কাদামাটির তাল দিয়ে কালকেতু-ফুল্লরা। সেই কালকেতু যার অন্তরের আগুনকে সামলানোর জন্য দেবী দান করলেন সাতঘড়া ধন। যে দিন কালকেতু দুর্গাষ্টমীতে স্বর্ণগোধা পেয়েছিল। মাটির ঘরে নিদ্রা গিয়ে পরদিন উঠে দেখে কালকেতু-ফুল্লরা আর নেই। আছে রাজা মেঘবাহন-মেঘাবতী। নগর-ঐশ্বর্য-সম্পদ-সুখ-সমৃদ্ধি-বিলাস এর স্রোত এ ভেসেছিল তারা। যা ছিল মাটি সব হয়েছিল সোনা। এক ভাণ্ডারীর লোভে সেই বৈভববের গুজরাট আবার বিজুবনে ঢেকে গেল। কালকেতুর সন্তানও এল না, তার রাজা হওয়াও হল না।

বস্তুত কালকেতুর এই পরিণামের কারণ তার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। সম্পদ পেয়ে তারা আর আখেটিয়া থাকেনি, মাটির সাথে, অরণ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। মাটিকে ভুলে ভালোবেসেছে ধাতু। অভয়ার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে বিশ্বাস করেছে যারা বনের সন্তান নয় তাদের। ফলে এই কাহিনি যেমন একদিকে কালকেতু-ফুল্লরার প্রকৃত আখ্যান তেমনি একটা সতর্কবার্তাও যে—অরণ্য ভোলা যাবে না, অভয়াকে ভোলা যাবে না। আখেটিয়া ব্যাধের অভিজ্ঞান স্থিতি, সম্পদ, বৈভব, ধাতু রাজৈশ্বর্য, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, কোনটাই নয়। লক্ষণীয় যে ভাণ্ডারী (সঞ্চয় যার নামের

সাথে যুক্ত)-র জন্য মিথের কালকেতু-ফুল্লরার সমস্ত ধ্বংস হয়েছিল তেমনি কাল্যার মৃত্যু ও ফুলির আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ সঞ্চয়ের নাগরিক প্রবৃত্তির। কাল্যা তাই তো দলছুট হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিসর দখল করে আছে। দুই বিপ্রতীপ সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রথা, বিশ্বাস, আচার, মনন, চিন্তন, মনস্তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করে তারা। আর্য-অনার্য নির্বিশেষে বিবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ক্ষমতাগত অবস্থান থেকে উঠে আসা নারী জগতে বৈপরীত্য আছে, সুরের মিলে যাওয়া আছে। যে সমাজ থেকে তারা উঠে এসেছে, তাদের দৃষ্টিতে সেই সমাজ ও ব্যবস্থার মূল্যায়ন দ্বারা সমগ্র শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনও আছে। মুকুন্দর গ্রামজীবনের দুই নারী উপন্যাসে বিশেষ অংশ অধিকার করেছে। এক নাবালককে নিয়ে অসহায় এক নারীর প্রতিষ্ঠার লড়াইতে দৈবকীর ভূমিকার বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। মুকুন্দরামের স্ত্রী অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সুখী হয়েছে। তাকে গ্রাম ও নগর উভয় জীবনেই আমরা দেখি সুখে-দুখে-ধৈর্যে, স্থৈর্যে, স্নেহ-মায়া-মমতায়, প্রেমে, ক্ষমায়, কর্তব্য পালনে চিরায়ত নারীমূর্তির প্রতীক হিসেবে।

উপন্যাসে, গ্রামজীবনের এক বিশিষ্ট নারীচরিত্র ময়নাবুড়ি। বাল্যবিধবা, বাবার ঘরে যার ঠাঁই হয়নি, মাথাটা একটু গোলমেলে, মুকুন্দর বাড়িতে আশ্রিতা কিন্তু তার মুখ দিয়েই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান, পরাধীনতা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অত্যাচার অসাম্য বঞ্চনার ছবি উদ্ভাসিত হয়—

> "বেটা ছেলে, এখন দেখতে ভাল। বড় হলে তো আমার বাপ হবে। আমার ভাই হবে। আর বউ-বোনকে উপাসি রেখে নিজে খাবে।"[১২]

নারীরা যাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে দমন করা হয়। তাই শিউলির প্রতি ময়নাবুড়ির দরদ বেশি। পুরুষদের প্রকৃত স্বরূপ তার চোখ দিয়ে তুলে ধরে ঔপন্যাসিক ব্যঙ্গের কষাঘাত করেন। নারীদের প্রতি অত্যাচার গ্রাম বা শহরে কোনো ভেদ নেই। আর্যসমাজের পুরুষতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে কাদুরা তাই নিত্য বলি হয়। নাগরিক জীবনে দনাদেবীকে মুকুন্দর স্ত্রীর প্রলম্বিত রূপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে নগর সভ্যতার নারীর ক্ষমতায়নের বিশেষ সূত্রটি ধরিয়ে দেয় গোপালির ছেলের বউ। সে জানে হাতে টাকা থাকলে স্বামী ছেলে সবাই বশ। নিজের বিছানায় নেবে স্বামী—

> "সংসার হাঁড়ি যার হাতে সেই তো গিন্নি।"[১৩]

অনার্য সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষে ভেদ নেই। পণ এখানে মেয়ের বাবাকে দিতে হয়। স্বামীর সাথে স্ত্রীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উপার্জন করে। আর্য সমাজের উচ্চবর্ণে এটা দেখা যায় না, তবে নিম্নবর্ণে অবশ্য একই ছবি মেলে। যেখানে মন বসে অনার্য নর-নারীরা বিয়ে করে, বিয়ের পর আলাদা ঘর বাঁধে। ঝগড়া হলে কেউ পড়ে পড়ে মার খায় না, মন না বসলে উভয় উভয়কে ত্যাগ করে পুনর্বিবাহ করতে পারে। নারী পুরুষে ভেদ নেই বলেই ডঙ্ক মেঘাকে বিদ্যা না দিয়ে তেজটাকে দিয়েছিল আবার তেজটাও আপন সন্তানের থেকে ফুলিকে বিদ্যার যোগ্যতম প্রার্থী বলে মনে করে। তাদের স্বামী শিকার করে, স্ত্রীরা যায় বিক্রি করতে। শেফালীদের মত ঘরের বাইরে যাওয়ার মত প্রতিবন্ধকতা তাদের নেই।

উপন্যাসে ফুলি চরিত্র আপন মহিমায় উজ্জ্বল। ফুলির গায়ে নগর সংস্কৃতির হাওয়া লেগেছে। তাকিয়ে দেখে মুকুন্দর স্ত্রীর সাজানো সংসার, সুপ্ত একটা ইচ্ছে মনে উঁকি দেয় তাই তাদের বাড়ির পাশে ছুটে ছুটে যায়। ফুলির হৃদয়ে এক অলৌকিক প্রেমের শক্তি আছে যা তাকে অন্যান্য শবর মেয়েদের থেকে যেমন পৃথক করে তেমনই নাগরিকতা বা অন্য যে কোনো প্রলোভন জয় করার শক্তি দেয়। তার অন্তরের হতে উৎসার সেই অপার্থিব প্রেমের কী অপূর্ব মহিমা! যার জন্য সমাজ, সংসার, জীবন, সুখ সব তুচ্ছ। কাল্যা বিনে সে যাবে কোথায়? সাধের শাড়িটাকে বেঁধে জলে ডুবে মরে গিয়ে কাল্যার পাশে কাল্যার প্রিয় অরণ্যের মাটিতে মিশে যাওয়া তার কাছে পরম ও শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। দৈবকী, ময়নাবুড়ি, কাদু হতে চায় না সে, এমনকি শ্রীরাধিকাও না। তারা বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকবে। ফুলির কাছে 'বাঁচা' আর 'জীবনের'

অর্থ ভিন্ন। প্রেমের এই অজেয় শক্তিই সেই প্রণদনার জন্ম দেয়, যা মুকুন্দরামকে কবি মুকুন্দরামে উন্নীত করার শক্তি জোগায় ভবিষ্যতে। এবার মুকুন্দর বুঝতে বাকি নেই অভয়া আসলে কে? অভয়া আসলে কী? তাঁর কলমে কাল্যা হবে কালকেতু। ফুলি হবে ফুল্লরা। তারা অমর, তাদের প্রেম অমর যেমন অমর এই আদিম অরণ্য। 'অভয়ামঙ্গল' এর শুরু হবে ব্যাধখণ্ড দিয়ে, শবর ছাড়া অরণ্য প্রতিষ্ঠা হবে না, অরণ্য প্রতিষ্ঠা না হলে অভয়ার প্রতিষ্ঠা হবে না। এভাবেই উপন্যাসের শেষটুকুতে ইতিহাসের ছোঁয়া লাগে। এভাবেই আখ্যানধর্মী কাব্য ও তাতে সমাহিত ভিন্ন এক ইতিহাস ভেদ করে জেগে ওঠে উপন্যাস, শবর, শবরদের ইতিহাস আবার ভিন্ন ইতিহাস ফিরে পায় আপন সূত্রধার।

বিশ শতকের শেষ দশকে 'ব্যাধখণ্ড' এক বিশিষ্ট মাইল ফলক। একমেরুর বিশ্বে যখন ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মস্বার্থ, আত্মসুখের অসুখ ছড়িয়ে পড়েছে, ধর্মান্ধতার বিষে সুপ্রাচীন মূল্যবোধগুলো যখন তলিয়ে যাচ্ছে তখন লোককথা-পুরাণ-উপকথা, জীবন ও জীবনসংগ্রামের মধ্যদিয়ে মানবতার সাধনা করা মহাশ্বেতা দেবী যথার্থ অর্থেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী। তাঁর এই উপন্যাস এক বিস্মৃতপ্রায় জাতিকে তাদের ইতিহাস ফিরিয়ে দেবার প্রয়াস। সভ্যতার মূলস্রোতের তাদের প্রতি চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস। ভূমিলগ্ন আদিবাসী জীবন আখ্যানকে এমন ভাবে তুলে ধরেন যা সুপ্রাচীন আদিবাসী কৌম জীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাসে সঞ্চারমান ভূমিকাই কেবল বলে না, বাংলা উপন্যাসের পরিধি বাড়ায়, আঙ্গিককে সাহসী করে, বাংলার সৃজনশীলতাকে সমৃদ্ধ করে, সর্বব্যাপী করে, উদার করে।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদিত), 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' (কবি মুকুন্দরাম বিরচিত, প্রথম ভাগ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ৩১
২. দেবী, মহাশ্বেতা, 'ব্যাধখণ্ড', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪, পৃ. ৪০
৩. তদেব, পৃ. ৪২
৪. তদেব, সূচনা অংশ
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদিত), 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' (কবি মুকুন্দরাম বিরচিত, প্রথম ভাগ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ২৩
৬. তদেব, পৃ. ১৭৮
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, 'ব্যাধখণ্ড', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৮. তদেব, পৃ. ৯৪
৯. তদেব, পৃ. ৭৬
১০. তদেব, পৃ. ৯৬
১১. তদেব, পৃ. ৮০
১২. তদেব, পৃ. ৩০
১৩. তদেব, পৃ. ৩০

গ্রন্থপঞ্জি :

ক. আকরগ্রন্থ :

১. মহাশ্বেতা দেবী, 'ব্যাধখণ্ড', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।

খ. সহায়ক গ্রন্থ :

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন,

কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০১৫
২. মহাশ্বেতা দেবী, শবর লোকগান ও লোককথা (সংকলক ও অনুবাদক প্রশান্ত রক্ষিত), নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, সংকলন, ২০১৩
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদিত), 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' (কবি মুকুন্দরাম বিরচিত, প্রথম ভাগ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

গ. সহায়ক অন্তর্জাল :

১. Layla Shams, শবর জাতির অতীত ও বর্তমান, ROAR MEDIA, 16 Jan 2019
২. রানা চক্রবর্তী, শবরজননী, EKHON KHOBOR.COM, Jan 14 2020

ঘ. সহায়ক পত্রিকা :

১. বর্তিকা : লোধাশবর সংখ্যা, ১৯৮২